দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

সত্তরের কবিতা : বিকেন্দ্রীভবন

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখা হয়েছে বেশ কিছু, সেই সঙ্গে যদি ভূগোলও লেখা হত দু-চারটে, অর্থাৎ সেই ভূগোলের ইতিহাস, আমার ধারণা, অনেক কিছুই প্রাঞ্জল হত তাহলে। খুব আলগাভাবে দেখলেও বোঝা যায়, হাজার বছরের বাংলা সাহিত্যে বার বার কেন্দ্র গড়ে ওঠা আর ভেঙে যাওয়ার একটা নিরন্তর প্রক্রিয়া চলেছে। কলকাতা শহরের মহানগরী হয়ে ওঠার আগে পর্যন্ত এই কেন্দ্র ছিল এক বা দুই নয়, বহু। কেন্দ্র, অন্তত, ভৌগোলিক অর্থে গড়ে উঠতেও পারেনি অনেকদিন পর্যন্ত। চৈতন্যদেবের আগের এক-দেড়শো বছরের সাহিত্য সম্পর্কে যেটুকু জানা যায়, তাতে কবিদের জন্ম এবং বসবাস বীরভূম, বাঁকুড়া, চব্বিশ পরগণা, নদীয়া, বরিশালের খ্যাত অখ্যাত গ্রামে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ও সমাজকে কেন্দ্র করে সাহিত্যের, অন্তত বৈষ্ণব সাহিত্যের একটি অনতিনির্দিষ্ট কেন্দ্র গড়ে উঠতে চলেছিল ঠিকই, কিন্তু বৈষ্ণব ধর্ম নিজেই বিকেন্দ্রিক হয়ে সেই সম্ভাবনাকে বেশি দূর এগোতে দেয়নি। আর এ-যুগের মঙ্গলকাব্যের মধ্যেই দেখা গেছে পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরবঙ্গের নিজস্ব ধারা। এযুগে সাহিত্যের একটি প্রকৃত কেন্দ্র যদি গড়ে উঠেছে, তা রোসাঙ রাজসভায়, মগের মুল্লুকে। এছাড়া কখনও কৃষ্ণনগর, কখনও বর্ধমানকে কেন্দ্র করে কাব্যকবিতার এক একটি ঘরানা গড়ে উঠতে চাইলেও তত দিনে বাংলার সব আলো শুষে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠেছে কলিকাতা।

কলকাতা বাংলাকে যেমন দিয়েছে অনেক কিছু, কেড়েও কম নেয়নি। একটা এত বড় জাতির একটাই গন্তব্য, একটাই মোক্ষ— এ-ঘটনা বাঙালি সংস্কৃতির বৈচিত্র্য ও বিভাকে অনেকদূর পর্যন্ত নষ্ট করেছে। কাঁচড়াপাড়ার ঈশ্বর গুপ্ত, বীরসিংহের বিদ্যাসাগর, কাঁঠালপাড়ার বঙ্কিমচন্দ্র তো বটেই, এমনকী রামকৃষ্ণকেও রামকৃষ্ণ হতে কলকাতাতেই আসতে হয়েছিল। গোটা উনিশ শতক জড়ে চলেছিল এই স্রোত। এর মধ্যে নিঃশব্দে বিদ্রোহ করেছিলেন যিনি ওই স্রোতটিকে বিপরীত দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে, তিনি রবীন্দ্রনাথ। নাগরিক অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে তাঁর কোপাইপাড়ের আশ্রমটি গড়ে না উঠলে কোথায় পেতাম আমরা কবিতা-গান-গল্পের ওই আলো, কোথায় পেতাম নাটকের ওই স্বতন্ত্র ধারা? পাওয়া কি যেত নন্দলাল বসু, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, সর্বোপরি রামকিংকর বেইজকে?

তবু, শান্তিনিকেতনের উত্থানকে আমি বিকেন্দ্রীভবন বলতে চাই না। বলতে চাই, বিকল্প একটি কেন্দ্রের নির্মাণ, বিশ শতকের প্রথম দিককার মহানাগরিক আগ্রাসন থেকে বেরিয়ে আসার জন্য এই নির্মাণটির প্রয়োজন ছিল মনে রাখতে হবে, রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত ক্যারিসমাই শুধু নয়, বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু হয়ে সশস্ত্র স্বাধীনতাযুদ্ধের আলোছায়াময় এই দিনগুলিতে কলকাতাকে বৈভবে না হোক বীরত্বে অনেকদূর ছাড়িয়ে এসেছিল মেদিনীপুর, চট্টগ্রাম, বরিশালসহ বিস্তৃত গ্রামবাংলা। এবং

স্বাধীনতাযুদ্ধের এই পর্বে ওই সব গ্রাম-আধাশহর থেকে কেবল আমাদের বীর নায়কেরাই উঠে আসেননি, উঠে এসেছিল দায়িত্বশীল সাময়িকপত্র, নতুন ধরনের আখড়া, নতুন এক যুবসমাজ। দর্জিপাড়ায় নতুনদাদের বিপরীতে ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্ত। সাহিত্যও এই পরিসরে বিকেন্দ্রিত হয়েছিল আর একবার। কবিতার ভরকেন্দ্র সরে গিয়েছে আবার অজয় নদের কোলে, পুব বাংলায়, ঢাকা, এমনকী লখনৌ শহরেও।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর যৌবনেই কলকাতা শহরকে যে দানবের রূপকল্পে দেখেছিলেন ('বিরাট মুঠিতলে চাপিছে দৃঢ়বলে ব্যাকুল বালিকারে, নাহিকো মায়া'), সেই দানবের মূর্তিটি সম্পূর্ণ হল স্বাধীনতা-দেশভাগের পর। ছোট্ট, ভাঙাচোরা একটা রাজ্যে জাম্বো মাপের একটা রাজধানী শহর। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান সমস্যা হয়ে উঠল কলকাতা। শিক্ষাদীক্ষা, চিকিৎসা, রাজনীতি, ব্যবসা, সিনেমা, থিয়েটার, খেলাধুলো, সংবাদপ্রচার— এক কথায় সবকিছুই কেন্দ্রীভূত হল কলকাতায়। সাহিত্যের এমনকী কবিতারও পণ্য হয়ে ওঠা, নিয়ন্ত্রিত হওয়া আরও সহজ এবং অবধারিত হয়ে উঠল চার তরুণের, কবিও তাঁরা, মাতাল প্রলাপে কী করুণ হয়ে ফুটে উঠল সেই পরাধীন আত্মঘাত—'মধ্যরাতে কলকাতা শাসন করে চারজন যুবক।'

এই প্রেক্ষিতেই সত্তর দশকের একটি আলাদা গুরুত্ব রয়ে গেছে তার দিশাহীন হিংসা-মত্ততা-অবাস্তব আদর্শবাদ সত্ত্বেও। বস্তুত, ষাট দশকের শেষ দিক থেকেই রাষ্ট্র নামক প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে, ক্ষমতার কেন্দ্রগুলির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘনীভূত হচ্ছিল। একই সঙ্গে লক্ষ করা যাচ্ছিল বাংলার নানা প্রান্ত থেকে এক একটি অনুচ্চ কবিকণ্ঠের উত্থান। উত্থান লিটল ম্যাগাজিনগুলির। সত্তরে লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতই বিকেন্দ্রিত হল বাংলা কবিতা। বঙ্গভঙ্গে, স্বাধীনতা আন্দোলনে যেমন, তেমনি সত্তরের মুক্তির স্বপ্নকে ঘিরে কবিতা আবার নাগরিক চৌহদ্দি ছাড়িয়ে, পণ্য হয়ে ওঠার গ্লানি থেকে মুক্ত হয়ে পুরুলিয়ায় নদীয়ায় কোচবিহারে মেদিনীপুরে হাওড়ায় কলকাতাতেও আরো মাটি আরো আলো মেখে নিতে চাইল। অদ্রীশ বিশ্বাসের একটি লেখা ('পঞ্চাশ-ষাট-সত্তরের কবিতায় বিকল্প সন্ধান', পরিকথা, ২০০৪) থেকে উদ্ধৃত করা যাক এ-দশকের বাংলা কবিতার ভূগোলটিকে : "কৃষ্ণনগর থেকে সুবোধ সরকার 'ঋক্ষ মেষ কথা'-য় বিধৃত কবিতাগুলিতে ধরেছিলেন সেই নগর বহির্ভূত জীবনের জটিল তারুণ্য, সংশয় আর ব্যক্তিগত রাজনীতিকে।"...

মেদিনীপুর থেকে লিখতে এলেন শ্যামলকান্তি দাশ, গ্রাম-মফস্বলের নানা আনপড় ছোঁয়াকে স্মার্টলি ব্যবহার করে একদম অন্য একটা মাত্রা দিলেন তিনি যেমন, হাওড়ার ব্রত চক্রবর্তীর গদ্যধর্মী উচ্চারণের মধ্যে দিয়ে চারপাশকে চেনার নাটকীয় উপস্থাপনা আরেক জাতীয় অসূক্ষ্ম কবিতা সূক্ষ্ম কবিতার গালে থাপ্পড় কষিয়ে দেওয়ার দুঃসাহসী রাজনীতি। হয়তো তারই সবচেয়ে ব্যাপক উদাহরণ নির্মল হালদার পুরুলিয়ার ভাদু-টুসু-ছৌ পর্যন্ত বাংলা কবিতার অভিজ্ঞতাকে কখনও তীব্র উচ্চারণে কখনও নম্র উচ্চারণে টেনে নিয়ে গেছেন তিনি। মনে পড়বে বীরভূমের একরাম আলির কবিতাও কিংবা জামসেদপুরের

কমল চক্রবর্তী, বারীন ঘোষালদের লেখালিখি, শ্রীরামপুরের সোমনাথ মুখোপাধ্যায়, চন্দননগরের অরুণ চক্রবর্তী, মেদিনীপুরের বীতশোক ভট্টাচার্য, চব্বিশ পরগণার বাপী সমাদ্দার, হুগলির সোমক দাস, হাওড়ার গৌতম চৌধুরী, অরণি বসু...।' বলা বাহুল্য নামের তালিকা আরো বাড়ানোই যায়। বলাই যায় রাণাঘাটের জয় গোস্বামী, অনুপ মুখোপাধ্যায়ের কথা, পুরুলিয়ার অশোক দত্ত, মুকুল চট্টোপাধ্যায়, অসিত সিংহর কথা, উত্তরবঙ্গের বিজয় দের কথা, মেদিনীপুরের অনুরাধা মহাপাত্রর কথা।

কিন্তু, ঘটনাটা কেবল কবিদের জন্মস্থান-বাসস্থানে সীমিত নয় আদৌ। কবিতার অন্তঃপ্রদেশেই ঘটে গিয়েছিল এক প্রগাঢ় প্রাকৃতায়ন। রণজিৎ দাশের মতো কোনো কোনো কবি অবশ্যই ছিলেন নাগরিক বাংলার প্রতিনিধি হয়ে, কিন্তু শহর কলকাতা থেকেই তখন কবিতায় গ্রামীণ বাংলাদেশকে, শতচ্ছিন্ন ভারতবর্ষকেও বন্দনা করছেন অমিতাভ গুপ্ত, অঞ্জন সেনের মতো কবিরা। কবিতা যেন শহরের চৌহদ্দি পেরিয়ে প্রাকৃতজনের ধুলোমাটি মেখে নিতে চেয়েছিল সেদিন। ১৯৯৩ সালে লেখা স্বাতী গুহর একটি গদ্যাংশ (কবিতার বিকেন্দ্রীভবন : উত্তর আধুনিকতা, বীজ, ১৯৯৩) উদ্ধার করা যাক এ-প্রসঙ্গে : 'কলকাতায় বসে রচিত হলেও এই কবিতা সংকলনগুলিতে (অমিতাভ গুপ্তর কাব্যগ্রন্থগুলিতে) কোনো নাগরিক চতুরালির সংক্রমণ নেই। চিরকালীন ইতিহাস ও দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে বিশ্বাসী কবির কাছে দেশমাতৃকাই ধরা দিয়েছেন মাটির মা হয়ে। 'মানবিক সম্পর্কের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা' ও 'নিরন্ন মানুষের অসম্মানের বিরুদ্ধে' জীবন ও শিল্পকে গড়ে তুলতে চান কবি :

তোমার সৌন্দর্য আমি রেখে যাব তরুণ কবির কাছে...
তরুণ কবিরা যেন তোমার সমস্ত মুখ জলে ধুয়ে দেয়
তরুণ কবিরা যেন মাটি খুঁড়ে জলাশয় টানে।

অঞ্জন সেনের 'গৌড়বচন'-এর 'আখ্যান' :

এই নদী কপালকুণ্ডলার এই বন আরণ্যকের
এই গ্রাম গণদেবতার পাঠ
স্মৃতির ভেতরে ছিলেম
এই সুর মৃত্তিকাময় লালনের
কিংবা আরো দীর্ঘকালের গায়ন।

সত্তরের শেষে লিখতে আসা গৌতম বসু, অনির্বাণ লাহিড়ী (পরে ধরিত্রীপুত্র), হেমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখর কবিতায় দেখা দিল নাগরিক-ঔপনিবেশিক খণ্ডব্যক্তিসত্তার পরিবর্তে প্রত্যয়ঋদ্ধ এক উত্তরব্যক্তিসত্তা। স্বাতী লিখছেন : 'তাই নগর কলকাতায় অবস্থান করেও গৌতম বসুর মতো কবির কাছে কবিতা-অন্বেষণ হয়ে ওঠে শুভকালের তথা অন্নপূর্ণার। কৃষি ও জলের বয়ানে ধরা পড়ে রামপ্রসাদী বাংলাদেশের সুর।...'

এ-প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো, সত্তরের কবিতার এই বিকেন্দ্রীকরণ কোনো একটি কাব্যরীতি কিংবা সুনির্দিষ্ট কাব্যভাবনার ফসল আদৌ নয়। যে কবিরা এ-পর্যন্ত উল্লিখিত হলেন, এবং আমার এই তুচ্ছ গদ্যপ্রয়াসের উল্লেখ-অনুল্লেখের কোনো তোয়াক্কা না করেই যাঁরা স্বমহিমায় উজ্জ্বল, তাঁদের প্রত্যেকের কবিতা আপন আপন স্বাতন্ত্র্যে বিশিষ্ট। এতজন

কবির আনুপূর্ব আলোচনা আমার সাধ্য ও সময়ের অতীত বলেই সুবিধামতো তুলে নিচ্ছি একজন কবিকে— পুরুলিয়ার নির্মল হালদার, যিনি দূর জেলা শহর থেকে সৈকত রক্ষিতের সঙ্গে তাঁদের বহু আলোচিত পত্রিকাটির নামে নিজেদের পরিচয় দিয়েছিলেন— 'আমরা সত্তরের যিশু' বলে।

নির্মল হালদার নগরনিষ্ঠ আধুনিক কবিতায় এক জীবন্ত বিদ্রোহ। প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশুনো থেকে দূরে, ভদ্রলোক বাঙালি পরিমণ্ডল থেকে দূরে ধূলিমলিন গ্রামীণ আবহে বেড়ে ওঠা এই যুবক একদিন ঘোষণা করলেন—

বাবুমশাই আমি নির্মল হালদার
এখনও আমার কথায় কথায় গরুর শিং ঢুকিয়ে
হো হো করে হেসে উঠছে রাখাল বালক

—বাবুমশাই/অস্ত্রের নীরবতা

তিনি বাংলা কবিতার নাগরিক ঘেরাটোপ থেকে সচেতন ভাবে বাইরে আসতে চেয়েছেন তরুণ বয়সের সেই সব লেখাতেই। কলকাতামুখী কবিতায় তখনও 'বাবু সমাজের রা'। নির্মলের কণ্ঠে প্রান্তের প্রত্যাখ্যান—

আমি কেন দাঁড়াব ওই লেখার কাছে, ওই লেখা কি আমার?
আমি আছি ধান খেতে ধান পাহারায়
আমি আছি মাঠে গরু ছাগল নিয়ে

—নগরকেন্দ্রিক/অস্ত্রের নীরবতা

তবু 'অস্ত্রের নীরবতা'য় অগ্রজ কোনো কোনো কবির ছায়া হয়তো বাংলা কাব্যভাষার পথ বেয়েই অন্তর্ঘাত ঘটিয়েছে। কিন্তু, এই কবির নিজস্ব অবয়বটি স্পষ্ট হয়ে উঠল তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'পুরোনো এ জীবন আমাদের নয়' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে। তত দিনে বাংলা কবিতার প্রাকৃতায়ন কবি ও তাত্ত্বিকদের লেখায় পূর্ণ সমর্থিত, এমনকী সম্মানিতও। নির্মল আরও প্রত্যয়ঋদ্ধ এতদিনে। প্রত্যাখ্যান তখন আর ঋণাত্মক নয়, কেননা, কবি চিনে নিয়েছেন তাঁর চিরন্তনকে, পরমকে—

আমরা গান গেয়ে ধান কেটেছি কাল
আমরা গান গেয়ে ধান কেটেছি আজ, এ বাদে
বাকি সব পুরোনো
পুরোনো এ জীবন আমাদের নয়

—পুরোনো এ জীবন আমাদের নয়/ওই

এই প্রত্যয়ই ধ্বনিত হয়েছে এর পর তাঁর 'সীতা' (১৯৮৪) নামের মৃত্যুহীন কাব্যপুস্তিকাটিতে। পড়ে নিতে পারি এ দু-একটি লেখা :

হাঁড়ির গায়ে ফ্যান লেগে আছে
হাঁড়ির গায়ে ফ্যানের গন্ধ
হাঁড়ির ভিতরে কতটুকু অন্ন?

অন্নই কি অন্নদাতা
হাঁড়ির ভিতর হাসছে
—হাসছে/সীতা

কিংবা—

মাটি বিক্রি করতে গেলে মনে হয়
মাকে বিক্রি করছি

মায়ের চোখ নেই মুখ নেই হাত নেই পা নেই
মা কেবল বুক পেতে দিয়েছে

এক ঝুড়ি মাটির দাম আট আনা
—অনাথপিণ্ডদ/ওই

অন্য একটি কবিতায় পুরুলিয়ার লোকগানের বয়ান—

পুঁটি মাছ সরষে দিয়া রাঁধিব
ভাত ঘরের ভাতার হে
তুমি মলে কী বলিয়া কাঁদিব
তুমি ঘরের কুলবতী
তুমি কাঁদলে শোভা পায় না
তুমি পুঁটি মাছ রাঁধিও
আমি মরণমুখে খাইব
—শোভা/ওই

লোকায়তের ভিতরে আবহমানের মুখ এভাবে বাংলা কবিতাকে অনেক দূর প্রসারিত করেছে।